দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..08 SEP 1998
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ৬

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৮

৮ সেপ্টেম্বর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষার আলো ● ঘরে ঘরে জ্বালো

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৫১.০১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২ বছরে বয়স্ক সাক্ষরতার হার প্রায় ৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার।
(খ) সাক্ষরতা বিস্তারে সরকারী বেসরকারী সংস্থার আন্তরিকতা ও উদ্যোগ।
(গ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন।
(ঘ) সরকারী উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার।
(ঙ) বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সারা দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।
(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী-বেসরকারী সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা।
(ছ) সাক্ষরতার স্বপক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী পর্যালোচনা করতে হলে আমদের একটু পেছনের দিকে যেতে হবে। স্বল্প পরিসরে ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হলেও এদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী বাস্তবায়নের ইতিহাস বেশ পুরানো। অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সময়ে গৃহীত সাক্ষরতা উদ্যোগসমূহ মূলতঃ সমন্বয়হীনতার কারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে জনগণের অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করে সকল নাগরিকের জন্য গণমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ব্যাপক আকারে সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ মোতাবেক কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে তৎকালীন সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে সরকার পরিবর্তনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এরপরে ১৯৮০ ও ১৯৮৭ সালে দু'দফা বিরতির পর পুনরায় কর্মসূচী চালু হলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি। ১৯৯১ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী (ইনফেপ) প্রকল্পের শুরু এবং ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে আলাদা মন্ত্রণালয় চালুর পর থেকে সরকারী পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার শুরু হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে থাকে।

সবার জন্য শিক্ষা'র নিম্নোক্ত জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার

সমান্তরাল ও পরিপূরক পদ্ধতি হিসেবে সরকারী পর্যায়ে ইনফেপের নেতৃত্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল ঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৭৬ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ;
(খ) ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৭০ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৯৪ ভাগে উন্নীতকরণ;
(গ) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৬০ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ;
(ঘ) বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩৫ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

১৯৯৭ সালে ইনফেপ প্রকল্পের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে। বিভিন্ন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/সংস্থা ইনফেপ প্রকল্পের মূল্যায়ন করেছেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, ইনফেপ প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১.৬৭ মিলিয়ন নিরক্ষরের স্থলে ২.৪৭ মিলিয়ন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ইনফেপ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যেমন ঃ

১। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাক্ষরতা চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব গড়ে গঠেছে।

২। ইনফেপ প্রকল্পের সফল সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থায়ী অবকাঠামো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সৃষ্টি হয়েছে।